রুদ্রাদিন লিখন

যতিচিহ্নহীন

রেজাউদ্দিন স্টালিন যতিচিহ্নহীন

মতিন বৈরাগী

TURNING THE PAGE
FOR 15 YEARS

KOBI PROKASHANI

রেজাউদ্দিন স্টালিন : যতিচিহ্নহীন
মতিন বৈরাগী

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য ৪৫০ টাকা

Rezauddin Stalin: Jotichinhahin by Matin Bairagi Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 450 Taka RS: 450 US 25 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN 978-984-29140-9-6

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

অনুজ প্রতিম সংগ্রামী কবি
মোহন রায়হান
স্নেহ আর নিরন্তর শুভকামনায়—

মূল্যায়ন

রেজাউদ্দিন স্টালিন সমকালীন বাংলা কবিতায় কেবল একটি কণ্ঠস্বরই নয়, একটি অবস্থান, যেখানে সময় ইতিহাস, রাজনীতি একে অপরের ভেতর প্রবেশ করে মানবচেতনার মানচিত্র নির্মাণ করে। তাঁর কবিতায় সময় আর নিরপেক্ষ কালধারা থাকে না, হয়ে ওঠে দগ্ধ, ক্ষতবিক্ষত, পুনরাবৃত্ত এবং ইতিহাসের স্মৃতি। এরকমই আমরা দেখি ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের ইতিহাস-ভাবনায়, বা পল সেলানের কবিতায় সময়ের ট্রমাটিক উপস্থিতিতে। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে তুলনায় রেজাউদ্দিন স্টালিন সেই কবিদের ধারাতেই অবস্থান করেন, যাঁরা ইতিহাসকে বাহ্যিক পটভূমি হিসেবে নয়, বরং মানবাত্মার অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখেছেন। গ্রিসের ট্র্যাজিক চেতনা থেকে শুরু করে আধুনিক ইউরোপীয় অস্তিত্ববাদী সাহিত্য পর্যন্ত যে মানবিক দ্বন্দ্ব, একাকিত্ব, ভয়, মুক্তির অসম্পূর্ণতা—তাঁর কবিতায় স্থানীয় বাস্তবতার ভেতর নতুনভাবে ভাষা পেয়েছে। ফলে তাঁর কবিতা একদিকে গভীরভাবে বাংলাদেশি, অন্যদিকে বিশ্বজনীন।

বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষাপটে স্টালিনকে পড়লে তাঁর কাব্যচেতনায় ফ্রাঞ্জ ফাননের ঔপনিবেশিক ক্ষতবোধ, আলবেয়ার কামুর অস্তিত্বগত নিঃসঙ্গতা এবং সার্ত্রীয় দায়বদ্ধ স্বাধীনতার প্রতিধ্বনি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে তিনি কেবল এই দার্শনিক ধারাগুলোর অনুবর্তী নন; বরং বাংলা সমাজ-বাস্তবতার ভেতর সেগুলোর নতুন পুনর্নির্মাণ ঘটান। যেমন মাহমুদ দারবিশ ভাষাকে রাজনৈতিক স্মৃতির বাহন বানিয়েছেন, স্টালিনও তেমনি শব্দকে পরিণত করেন প্রতিরোধের নান্দনিক হাতিয়ারে। ফুকোর ক্ষমতা তত্ত্বের আলোকে 'রাষ্ট্র ও ক্ষমতা কেবল বাহ্যিক দমনযন্ত্র নয়, বরং মানুষের ভাষা, স্মৃতি ও চেতনার ভেতরও প্রোথিত।' আবার দেরিদার মতোই স্টালিন জানেন, অর্থ কখনো একক নয়; নিপীড়নের মধ্যেও ভাষা নতুন অর্থের সম্ভাবনা বহন করে। এই কারণেই তাঁর কবিতা নিছক প্রতিবাদী ঘোষণায় সীমাবদ্ধ থাকে না, হয়ে ওঠে নান্দনিক প্রতিরোধ।

রেজাউদ্দিন স্টালিনের কবিতাকে আন্তর্জাতিক পরিসরে স্থাপন করলে প্রথমেই বোঝা যায়, তাঁর কাব্যভাষা নিছক জাতীয় পরিসরে আবদ্ধ নয়; বরং তা বিশ্বব্যাপী নিপীড়ন, প্রতিরোধ ও মানবিক সংকটের অভিজ্ঞতার সঙ্গে গভীরভাবে সংলাপে যুক্ত। আফ্রিকা, স্পেন ও লাতিন আমেরিকার কবিতার ইতিহাস মূলত দাসত্ব, ঔপনিবেশিকতা, স্বৈরতন্ত্র ও গৃহযুদ্ধের অভিঘাতে নির্মিত যে অভিঘাত স্টালিনের

কবিতার সময়চেতনার সঙ্গে শক্তিশালী রূপকে উপস্থিত। স্টালিনের 'অনাবৃত দিন', 'প্রতিচ্ছেদ বিন্দু', 'এই রক্তস্রোত', 'ডার্ক চকলেট' এবং অন্যান্য [আলোচনা ভুক্ত] ধারাবাহিকতারই একটি রূপ, যেখানে ইতিহাস ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়, আর ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতা হয়ে ওঠে নাগরিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতীক। সবশেষে বলা যায়, স্টালিনের কবিতা আমাদের শেখায় ইতিহাস কখনো সম্পূর্ণ উন্মোচিত নয়, মুক্তি কখনো চূড়ান্তও নয়, ভাষা কখনো নিঃশেষ হয় না। মৃত্যু অনিবার্য হলেও কণ্ঠ থেকে যায়, সময় নিষ্ঠুর হলেও মানুষ পুনর্গঠনের স্বপ্ন ত্যাগ করে না।

সেঙ্গোরের কবিতায় 'নেগ্রিচ্যুদ' কেবল সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ঘোষণা নয়; এটি ঔপনিবেশিক ভাষা ও ক্ষমতার বিরুদ্ধে আত্মমর্যাদার পুনর্দখল। তাঁর কবিতায় আফ্রিকান স্মৃতি, শরীর, ছন্দ ও প্রকৃতি রাজনৈতিক প্রতিরোধে রূপান্তরিত হয়। কবি রেজাউদ্দিন স্টালিনের কবিতায় ব্যক্তিগত অনুভূতি কেবল আত্মগত নয়, ইতিহাস ও রাষ্ট্রের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত এক সমষ্টিগত স্মৃতির বাহন। সেঙ্গোর যেমন ফরাসি ভাষাকে ভেঙে আফ্রিকান চেতনার বাহন করেন, স্টালিন তেমনি রাষ্ট্রীয় ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক ভাষাকে ভেঙে মানুষের অনাবৃত সত্যকে সামনে আনেন। দুজনের কবিতায়ই ভাষা পরিচয়ের যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে কবিতা আত্মপরিচয় উদ্ধার করার এক নান্দনিক কৌশল। স্পেনের কবি ফেদিরিকো গার্সিয়া লোরকার কবিতা গৃহযুদ্ধ-পূর্ব স্পেনে নিপীড়ন, ভয় ও মৃত্যুচেতনার এক গভীর নান্দনিক দলিল। তাঁর কবিতায় প্রতীক, মিথ ও লোকজ চিত্র ব্যবহার, রাজনৈতিক সহিংসতার ট্র্যাজেডি ব্যক্তিগত যন্ত্রণায় রূপ নেয়। রেজাউদ্দিন স্টালিনের কবিতার সঙ্গে এখানেই এক গভীর সাদৃশ্য তৈরি হয়। যেমন লোরকার 'মুন', 'রক্ত' বা 'নীরবতা' রাজনৈতিক আতঙ্কের রূপক, তেমনি স্টালিনের 'অনাবৃত দিন', 'প্রতিচ্ছেদ বিন্দু', 'লাইকা', 'যতিচিহ্নহীন', 'ডার্ক চকলেট' রাষ্ট্রীয় সহিংসতার প্রতীকী ভাষা। লোরকার মতো স্টালিনও জানেন সরাসরি স্লোগান নয়, বরং নান্দনিক সংকেতই দীর্ঘস্থায়ী প্রতিবাদের কঠিন ভাষা হতে পারে।

নেরুদার কবিতা ব্যক্তিগত প্রেম থেকে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব—দুই পরিসরেই সমানভাবে সক্রিয়। তাঁর Canto General-এ ইতিহাস, ভূগোল ও মানুষের শ্রম একত্রে রাজনৈতিক মহাকাব্যে রূপ নেয়। রেজাউদ্দিন স্টালিনের কবিতায় যদিও মহাকাব্যিক বিস্তার নেই, তবু তাঁর সময়চেতনা নেরুদার মতোই ঐতিহাসিক ও সমষ্টিগত। নেরুদা যেমন শব্দকে জনগণের কণ্ঠে রূপ দেন, স্টালিন তেমনি শব্দকে নাগরিক চেতনায় প্রতিধ্বনি তোলেন। উভয়ের কবিতায় রাষ্ট্র ও ক্ষমতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি নিজের কণ্ঠকে জনগণের কণ্ঠে রূপান্তর করেন।

সংগতই বলা যায়, রেজাউদ্দিন স্টালিনের কবিতা আন্তর্জাতিক পরিসরে আফ্রিকা, স্পেন ও লাতিন আমেরিকার প্রতিরোধী কবিতার সঙ্গে একই ঐতিহাসিক রেখায় অবস্থান করে, যেখানে কবিতা শুধু সৌন্দর্যের অনুশীলন নয়, বরং মানবিক

অস্তিত্ব রক্ষার এক নৈতিক ঘোষণা। এই তুলনামূলক পাঠ তাঁর কবিতাকে কেবল জাতীয় সাহিত্যে নয়, বরং বিশ্বমানবিক চেতনার এক অনিবার্য অংশের সাথে যুক্ত করে।

[নোট : সেঙ্গোর ছিলেন একাধারে আধুনিক সেনেগালের প্রথম রাষ্ট্রপতি [১৯৬০-১৯৮০], একজন বিশ্বখ্যাত কবি এবং দার্শনিক। তিনি প্রথম আফ্রিকান হিসেবে 'আকাদেমি ফ্রঁসেজ'-এর সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে আফ্রিকান সংস্কৃতি এবং পশ্চিমা শিক্ষার মধ্যে একটি সমন্বয় প্রয়োজন। তার কাছে নেগ্রিচ্যুদ ছিল আফ্রিকান মূল্যবোধের সামগ্রিক রূপ।

* পল সেলান জন্ম : ১৯২০ সালের ২৩ নভেম্বর, ১৯৭০। বর্তমান ইউক্রেনের [তৎকালীন রোমানিয়া] চের্নিভিৎসিতে একটি জার্মানভাষী ইহুদি পরিবারে। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং প্রভাবশালী জার্মান ভাষার কবি। হলোকাস্টের প্রভাব : ১৯৪২ সালে নাৎসিরা তার বাবা-মাকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠায়, যেখানে তারা মারা যান। সেলান নিজে একটি লেবার ক্যাম্পে বন্দি ছিলেন। এই ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি তার কবিতার মূল সুর হয়ে দাঁড়ায়। তিনি মূলত একজন রোমানীয় ইহুদি ছিলেন, যার জীবন এবং সাহিত্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ও হলোকাস্টের [ইহুদি নিধনযজ্ঞ] স্মৃতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত।]

মতিন বৈরাগী
১৩৮৩/৮/সি, খিলগাঁও, নতুনবাগ, ঢাকা।

সূচিপত্র

রেজাউদ্দিন স্টালিনের কবিতা : দর্শন, মনস্তত্ত্ব ও মানব-অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ ১৩
শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গে টলস্টয় ১৬
কবিতা মিথ ও বাস্তবতা : প্রেম ও প্রতিবাদ ১৭
সামগ্রিক মূল্যায়ন ৬৮
নন্দনতত্ত্ব ও এজিস্থাসের বিলাপ ৯০
কবিতা বনাম ইতিহাস ১১৭
অতিবাস্তবতার প্রভাব ১২২
সময় ও কবির অবস্থান ১৪৪
সময়, ইতিহাস ও রাজনীতি ১৫৫
উপসংহার ১৫৮
সহায়ক গ্রন্থাবলি ১৫৯

রেজাউদ্দিন স্টালিনের কবিতা : দর্শন, মনস্তত্ত্ব ও মানব-অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ

রেজাউদ্দিন স্টালিনের কবিতা আবেগের ভাষা হিসেবে পড়লে অনেকটাই অনাবিষ্কৃত থেকে যাবে এর আনন্দ। তাঁর কবিতায় মূল মানুষের অস্তিত্ব সংকট, মনস্তাত্ত্বিক চাপ, এবং সমষ্টিগত চেতনার আন্দোলন এই তিনটি স্তরের সুষম সমন্বয়। ফলে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দর্শন ও মনস্তত্ত্ব উভয় কাঠামোর সহায়তা খুঁজতে হয়। হাইডেগার মানুষের অস্তিত্বকে সময়ের মধ্যে স্থাপিত হিসেবে দেখেছেন। স্টালিনের কবিতায় সময় একটি সক্রিয় শক্তি, স্মৃতি, ইতিহাস, বর্তমান সবকিছু সময়ের চাপেই পরিবর্তিত হয় তাকে ধরবার একটা চেষ্টাও রয়েছে। সার্ত্র বলেছেন, মানুষ স্বাধীন, কিন্তু তার স্বাধীনতা তাকে অস্থির করে। স্টালিনের প্রেম, রাজনীতি, সম্পর্ক সব জায়গায় মানুষের স্বাধীনতার সংকট ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জটিলতাকে উপজীব্য করেছেন। কবিতাগুলোর আভ্যন্তরীণ বিষয়াদিতে বেদনা মৌলিক হলেও পরাজয় নেই; বরং এক ধরনের তীব্র মানবিক জেদ যা কামুর অ্যাবসার্ড তত্ত্বের সঙ্গেও মিলিয়ে পড়া যায়।

কবিতা মূলত অবচেতনের ভাষা। ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের আচরণের মূল চালিকাশক্তি তার অবচেতন। কবির কবিতায় হঠাৎ চিত্র, অব্যক্ত ভয়, দুঃস্বপ্ন, অস্থিরতা এগুলো অবচেতনের ভাষা। তার কবিতায় প্রেম কখনোই নিছক সৌন্দর্যের বিষয় হয় না; এটি এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো যেখানে আকর্ষণ, ভয়, ভেঙে পড়া, আবার দাঁড়িয়ে ওঠা সবই যুক্ত। রাজনৈতিক হতাশা, ক্ষমতার দমন, ইতিহাসের ক্ষত, মানুষের ভগ্নস্বপ্ন, সাধারণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এগুলোর বিদ্যমানতায় অধিকাংশ প্রচল কবিতা থেকে তার কবিতাকে স্বাতন্ত্র্যতা দেয়। ব্যক্তিগত বেদনার রূপান্তর ঘটে রাজনৈতিক বেদনায়, রাজনৈতিক বেদনা ফিরে আসে সাধারণের চেতনা জাগ্রতির প্রতিধ্বনি হয়ে। তার কাব্যিক ভাষা স্পষ্ট, সংযত, এবং তীব্র।

অ্যারিস্টটল সংস্কৃতিকে মানুষের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের সাথে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'সংস্কৃতি একটি সমাজকে উন্নত করতে এবং নাগরিকদের মধ্যে ভালো গুণাবলি তৈরি করতে সহায়ক'। অ্যারিস্টটল সংস্কৃতিকে শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবেও দেখেছেন। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট সংস্কৃতিকে মানুষের স্বাধীনতা এবং

আত্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রকাশ হিসেবে দেখতেন। তিনি মনে করতেন, সংস্কৃতি মানুষকে প্রকৃতির নিয়ম থেকে আলাদা করে এবং তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে সাহায্য করে। কান্টের মতে, সংস্কৃতি জ্ঞান এবং শিল্পের মাধ্যমে মানব সমাজের উন্নতি ঘটায়। হেগেল সংস্কৃতিকে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ভেবেছেন। তাঁর মতে, সংস্কৃতি হলো সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি সমাজ তার চেতনা এবং মূল্যবোধকে প্রকাশ করে। হেগেল মনে করতেন, সংস্কৃতি দ্বন্দ্ব এবং বিকাশের মাধ্যমে একটি চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। এসব তত্ত্ব সমাজে ঐতিহ্যের মতো আজও জীবন্ত স্রোতের মতো আমাদের পৌঁছায় আধুনিক যুগের চিন্তা ও দর্শনে কাব্য-শিল্প-সাহিত্য ভাবনার মিলিয়ে নিতে। [হেগেলের দর্শন] কোনো কিছুর রহস্য মানুষ এক সঙ্গে আয়ত্তে নিতে পারেনি। বিকাশ ঘটেছে ধাপে ধাপে, ফলে গতকালকার ভাবনায় বদল ঘটে গেছে আজকের প্রেক্ষাপট। এটাকে এঙ্গেলসের ভাষা 'নিগেশন অব নিগেশন' বলা হয়।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে ভাষাতত্ত্ব ও দর্শনে এক বিপ্লবী পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। ঐ সময় পর্যন্ত সাহিত্য বিশ্লেষণ প্রধানত লেখকের জীবন, উদ্দেশ্য বা সমাজবাস্তবতার ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু ফার্দিনান্দ দ্য সস্যুর ভাষার কাঠামো বিশ্লেষণ করে দেখান অর্থ কোনো বস্তুর ভেতরে নিহিত নয়; অর্থ গঠিত হয় চিহ্নগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে। তাঁর মতে, ভাষা হলো একটি চিহ্নতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যেখানে প্রতিটি শব্দ বা সংকেতের মান নির্ধারিত হয় অন্য শব্দের সঙ্গে তার পার্থক্যের দ্বারা। অর্থাৎ, ভাষা হলো একটি সম্পর্কনির্ভর গঠন, এই ধারণাই পরবর্তী সময়ে কাঠামোবাদ নামক এক নতুন চিন্তাধারার ভিত্তি স্থাপন করে এবং তা ধীরে ধীরে উত্তর আধুনিকতায় উত্তর কাঠামোবাদ, উত্তর উপনিবেশবাদ তত্ত্বে রূপান্তর ঘটে।

এই চিন্তাকে সম্প্রসারিত করেন ক্লদ লেভি-স্ট্রস, যিনি বলেন, সমাজ ও সংস্কৃতিও ভাষার মতো এক গঠনমূলক ব্যবস্থা। মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতি গঠিত হয় বাইনারি অপজিশন বা দ্বিবিরোধী শব্দ জোড়ার মাধ্যমে যেমন কাঁচা/রান্না, প্রকৃতি/সংস্কৃতি, পুরুষ/নারী, জীবন/মৃত্যু। এইসব বিপরীতের মধ্য দিয়ে মানুষের ভাবনা গড়ে ওঠে, এবং সংস্কৃতি এক অদৃশ্য ব্যাকরণে নিয়ন্ত্রিত হয়। লেভি-স্ট্রসের এই বিশ্লেষণই সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞানে কাঠামোবাদকে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মর্যাদা দেয়। কিন্তু এই কাঠামোর স্থিতি ও নির্ভরযোগ্যতাকেই প্রশ্ন করেন জ্যাক দেরিদা তার গ্রামোটোলজি গ্রন্থে। তিনি দেখান, অর্থ কখনো স্থির থাকে না; বরং তা ক্রমাগত বিলম্বিত ও প্রত্যাহারিত হয়। এই ধারণাকে তিনি 'ডিফারেন্স' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং দেখিয়েছেন অর্থ এমন এক প্রক্রিয়া, যা চিহ্ন থেকে চিহ্নে সরে যায়, কখনো পূর্ণতা পায় না। অর্থাৎ, পাঠের মধ্যে সর্বদা থাকে অনুপস্থিতির ছায়া। এর মধ্য দিয়েই দেরিদা ঘোষণা করেন 'কেন্দ্র বলে কিছু নেই; প্রতিটি পাঠেই এক নতুন অর্থের জন্ম।' এভাবেই কাঠামোবাদ থেকে জন্ম নেয় উত্তর কাঠামোবাদ,

যেখানে পাঠ আর কোনো স্থির কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, বরং অর্থ হয়ে ওঠে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ও বহুমাত্রিক।

দেরিদার এই ভাবনার সঙ্গে সমান্তরালে মিশেল ফুকো বিশ্লেষণ করেন জ্ঞান, ভাষা ও ক্ষমতার সম্পর্ক। তিনি দেখান, সমাজের প্রতিটি বয়ান বা 'ডিসকোর্স' আসলে এক ধরনের ক্ষমতার রূপ—যা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে তার অজান্তে। স্কুল, হাসপাতাল, ধর্ম বা রাজনীতি—সবখানেই ভাষা ক্ষমতার বাহন হয়ে কাজ করে। তবে ফুকো বলেন, ক্ষমতা সর্বত্র, তাই প্রতিরোধও সর্বত্র; যেখানে ক্ষমতা আছে, সেখানে প্রতিরোধের সূত্রও বিদ্যমান।

এই বোধকে মানবিক মাত্রা দেন আলবেয়ার কামু, যিনি বলেন 'মানুষ এক অযৌক্তিক জগতে অর্থ খোঁজে, অথচ পৃথিবী তাকে কোনো অর্থ দেয় না।' তবু মানুষ থামে না; সে অর্থহীনতার মধ্যেই অর্থ সৃষ্টি করে, বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। কামুর 'অযৌক্তিকতার দর্শন' মানুষের স্বাধীনতাকে দেয় নৈতিক মহিমা যা ভাষা ও কাঠামোর বাইরে এক মানবিক স্বর। অন্যদিকে, লুঁই আলথুসার কাঠামোবাদের মধ্যেই সমাজ ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্র কেবল দমনযন্ত্র নয়; বরং আদর্শবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র 'আইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস' যেমন শিক্ষা, পরিবার, ধর্ম ও গণমাধ্যম—মানুষের চেতনা গঠন করে এমনভাবে যে, মানুষ নিজেই তার শাসনের অংশ হয়ে পড়ে। তবু এই কাঠামোর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে পরিবর্তনের সম্ভাবনা, কারণ চেতনা যেমন নির্মিত হয়, তেমনই তা ভাঙাও যায়। [মার্কসিস্ট ইন্টারনেট আর্কাইভ ও উইকিপিডিয়া] এইসব চিন্তা মিলিয়ে তৈরি হয় এক জটিল কিন্তু মুক্ত ধারার দর্শন, যেখানে অর্থ, মানুষ ও সমাজ—সবকিছুই এক গতিশীল পাঠ্য। কবিতা বা সাহিত্য বিশ্লেষণে এই তত্ত্বগুলো সাহায্য করে আমাদের বুঝতে—কবির শব্দ, প্রতীক ও নীরবতাও আসলে এক চিহ্নতাত্ত্বিক বিন্যাস, যার অর্থ স্থির নয়, বরং পাঠকের ভাবনায় ক্রমে পুনর্নির্মিত হয়।

শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গে টলস্টয়

লিও টলস্টয় শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ মতামত রেখেছেন তার *What is Art?* গ্রন্থে। তিনি বিশ্বাস করতেন শিল্পের মূল লক্ষ্য মানবিক সংযোগ সৃষ্টি করা, মানুষের অনুভূতি একে অপরের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যম। একজন শিল্পী যে অনুভূতি তার সৃষ্টিতে উন্মুক্ত করেন, সমাজ সম্পর্কের সঙ্গে সংযোগে তা কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কযুক্ত, পাঠক/শ্রোতা/দর্শক সেই অনুভূতির সঙ্গে তার আবেগ ও কল্পনার জগৎ উন্মুক্ত করে নতুন অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। টলস্টয়ের মতে, 'শিল্প এমন হবে যা সাধারণ মানুষও বুঝতে পারে', উপলব্ধি করতে পারে। তাঁর *দ্য ডেথ অব ইভান ইলিচ* উপন্যাসে ইভান ইলিচ মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে উপলব্ধি করেন, জীবন আসলে কৃত্রিমতা ও আত্মপ্রবঞ্চনার বিষয় নয়। উপন্যাস দেখায়, সমাজে সম্পর্কগুলো প্রথাগত ও স্বার্থনির্ভর হয়ে উঠলে মানুষ একাকিত্বের সংকটে পড়ে। 'নৈতিক ও নৈতিকতাবিরোধী' শিল্পকে তিনি শিল্প বলে স্বীকৃতি দিতে চাননি। প্রকৃত শিল্প মানুষের নৈতিক ও আত্মিক উৎকর্ষ সাধন করে। তাই কেবল রূপ-সৌন্দর্যের জন্য সৃষ্ট শিল্পকর্মের প্রতি তার তেমন আগ্রহ ছিল না; বরং তিনি চাইতেন, শিল্প এমন কিছু হোক যা সমাজকে ন্যায় ও নীতির পথে চালিত করবে। এই ন্যায় ও নীতি মূলত রাষ্ট্রীয় ভাবাদর্শের সাথে যুক্ত। রাষ্ট্রের কতৃত্ববাদী শাসন, জনআকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা, জনশক্তির নির্মম অপচয়, গণতন্ত্রহীনতা, বৈষম্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে নৈতিকভাবে যারা প্রথমেই মানসিক বিদ্রোহের উপস্থিতি ঘটান তারা কবি শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী। তারাই চেতনাকে সামাজিক জলাশয়ে বিরাট আবর্তের মতো ছড়িয়ে দেন যা আস্তে আস্তে কূল অবধি পৌঁছায়। আবর্ত যেমন দীর্ঘ যাত্রা সরু চিকন হয়ে কূলে লগ্ন হয় এবং যাত্রায় প্রায় অদৃশ্য থাকে তেমনি শিল্প-সাহিত্য চেতনা খুবই নীরবভাবে সমাজ মনে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটায়। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষমতাদখলের মনোবৃত্তিতে জনমনোকাঙ্ক্ষাকে রাজনৈতিক রূপ দেন, মানুষকে আন্দোলনমুখী করেন। রাজনৈতিক শক্তির ন্যায় ও ন্যায্যতার ভিত্তিটাও শিল্প-সাহিত্য নির্মাণ করে। তাই শিল্প-সাহিত্য ব্যক্তিমানুষের সৃষ্টি এবং সামাজিক চৈতন্যের নবতর রূপায়ণ।